নোটবুক সিরিজ- ১

#1 *NEW YORK TIMES* BESTSELLER

দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড

জন বোল্টন

(ট্রাম্প আমলের আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার)

রিভিউ

হোসাইন আহমদ

নোটবুক সিরিজ-১

The Room Where It Happened

দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড্

জন বোল্টন

রিভিউ আলোচনা

হোসাইন আহমদ

আহরার পাবলিশার্স

সর্বস্বত্ব লেখকের।
কোনরকম পরিবর্তন ছাড়া যে কেউ কপি করতে পারবেন।

প্রকাশকঃ
আহরার পাবলিশার্স
রংমহল টাওয়ার, বন্দরবাজার, সিলেট।

মুল্যঃ ৭০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল প্রেরণা..... ৭
আন্তর্জাতিক সংস্থা দূর্বলের বিরুদ্ধে শক্তিমানের হাতিয়ার..... ৭
ট্রাম্প-কিম আলোচনা..... ৮
আমেরিকার নেগোসিয়েশনে পরাজয়..... ৯
ট্রাম্প-পুতিন আলোচনা ও আফগান ভীতি..... ১১
"আই লাভ অ্যাঞ্জেলা" ট্রাম্প..... ১৭
আমেরিকা-ইসরাইল বন্ধুত্ব..... ১৮
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ..... ২০
আমেরিকার খৃস্টান সমাজ..... ২১
এরদোয়ানকে ট্রাম্পের মিথ্যা আশ্বাস..... ২২
এরদোয়ান আইএসের খেলাফত ধ্বংস করতে চাইতেন..... ২৩
হট ইস্যুঃ আফগানিস্তান..... ২৫
আফগানিস্তান, ব্যর্থতার ইতিহাস..... ২৭
বিশৃঙ্খলা যখন লাইফস্টাইল..... ৩৪
জামাল খাশোগী হত্যা..... ৩৫
আমেরিকার কাছে সৌদি-আমিরাতের মর্যাদা..... ৩৮
আফগানিস্তানঃ আমেরিকার কবরস্থান..... ৩৯
তালেবানের সাথে চুক্তি কি ট্রাম্পের একক সিদ্ধান্ত?..... ৪১
তালেবানের সাথে আলোচনায় আমেরিকার সকল
হিসেব-নিকেশের ওলট-পালট..... ৪২

বই ঃ The Room Where it Happened.
লেখক ঃ জন বোল্টন।

আলোচ্য বিষয়ঃ আমেরিকা-ইসরাইল সম্পর্ক। ট্রাম্প প্রশাসনের যুদ্ধে অনিহা। আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার। আমেরিকা-তালেবান চুক্তি। এরদোয়ান-ট্রাম্প দরকষাকষী। ইরান চুক্তি এবং কোরিয়া।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (ﷺ)এর উপর। পুরো বিশ্বের জন্য যাকে মুক্তিদুত ও রাহমাহ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

জন বোল্টন হলেন আমেরিকার সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক। আমেরিকাতে এই পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। ট্রাম্প আমলে ৪৫৩ (২০১৮-১৯) দিন এই পদে থাকা অবস্থায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া রুমে অবস্থান করেছিলেন। এজন্য এই বইয়ের নাম দিয়েছেন **The Room where it Happened** অর্থ্যাৎ সেই রুম যাতে এসব ঘটেছিল। হোয়াইট হাউসে ব্যয় করা তার সময়কালের কাহিনী নিয়ে সাড়া জাগানো এই বই খুব উৎসাহ নিয়ে কিনেছিলাম। কিন্তু যতো পৃষ্ঠা উল্টেছি ততো আমাকে হতাশ হতে হয়েছে। অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ভরপুর। যা শুধুই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। কখন কার সাথে নাস্তা করলেন, লাঞ্চ করলেন ইত্যাদি তথ্যে পৃষ্ঠার সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এই বইয়ের মূল লেখা প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তিনি কিভাবে জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক

নিযুক্ত হলেন। এর প্রক্রিয়া ও এ পথের বাধা-বিপত্তি নিয়েও কিছু বলেছেন। একটু এগিয়ে ২৭ নাম্বার পৃষ্ঠায় তার সাথে জেরার্ড কুশনারের আলোচনা তুলে ধরেছেন। কুশনার হলেন ট্রাম্পের মেয়ের জামাই। আনঅফিসিয়ালি খুব প্রভাবশালী ও প্রো-ইসরাইলী একজন ব্যক্তি। আর জন বোল্টনও প্রো-ইসরাইলী। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণায় এই কুশনারের ব্যাপক অবদান রয়েছে। তাছাড়া থ্রেট হিসেবে আরব রাষ্ট্রগুলোর মনোযোগ ইসরাইল থেকে ইরানের দিকে ঘুরিয়ে দিতে কুশনারের ভূমিকা দেখা গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি, কিভাবে আরব রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে ও ইরানের সাথে সম্পর্ক উত্তপ্ত করছে। ইরানকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান-তুরস্কের সাথে সৌদি-আমিরাত সম্পর্কের অবনতি ঘটতেও দেখেছি।

ট্রাম্পের ব্যাপারে বোল্টন বেশ ইন্টারেস্টিং তথ্য দিয়েছেন এই বইয়ে। এসব তথ্য যাচাই করলে বুঝা যায়, কেন তার নিজের দল রিপাবলিকানরাও তাকে আর চায় না। তাছাড়া ট্রাম্প আমেরিকার নোংরা রাজনীতিকে অনাবৃত করেছেন। একে অন্যের প্রতি তাদের নূন্যতম সম্মানও নেই। প্রশাসনের কোন পদটিতে আসতে চান, বোল্টনের সাথে এমন আলোচনার একপর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, আমি তোমাকে সেক্রেটারি অফ স্টেট দেখলে খুশি হব। কিন্তু "that son of a bitch Rand paul will vote against you।" ঐ কুত্তার বাচ্চা রেন্ড পল তোমার বিপক্ষে ভোট দেবে। এরপর ট্রাম্প জিজ্ঞেস করলেন, অন্য কোন পদ তোমার পছন্দ?

বোল্টন উত্তর দিলেন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজারের পদ। তখন ট্রাম্প বললেন, "So, I don`t have to worry about those clowns up there? Both Kelly and I said, right."

অর্থ্যাৎ সিনেটের সদস্যদের ট্রাম্প বলছেন ক্লাউন। বোল্টন ও কেলি এর

সমর্থন জানিয়েছেন। এই হল বর্তমান আমেরিকান প্রশাসনের মধ্যকার সম্মান ও সংহতির অবস্থা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল প্রেরণা

সিরিয়ায় আসাদের কেমিক্যাল হামলা ও তৎপরবর্তী ট্রাম্পের বক্তব্য "My honor is at stake" এর পরের আলোচনায় সুন্দর একটি উদ্ধৃতি এনেছেন বোল্টন। "fear, honor and interest are the main drivers of international politics and Ultimately war." পাশ্চাত্য বা সাধারণভাবে অনৈসলামিক রাজনীতির প্রকৃতিকে এই একটি বাক্য একসাথে নিয়ে এসেছে। যারাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ভাবতে চান, তাদেরকে এই তিনটি সূত্র আমলে নেয়া উচিত। ভয়, সম্মান ও স্বার্থ। এগুলোকে ঠিকমত ম্যানেজ করতে পারলে যুদ্ধে বিজয় সম্ভব। তবে যারা ইসলামি রাজনীতির প্রকৃতি জানেন না, তারা এখানে এসে ধাক্কা খান। কারণ তারা এই তিনটি বিষয় দিয়ে ইসলামের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের মাপতে চান।

তখন হিসেব মেলে না। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামের রাজনীতিতে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের স্বার্থ নয়, কিংবা ব্যক্তি বা দেশের সম্মান নয়, বরং ইসলামের নীতির সম্মান ও স্বার্থই মুখ্য ভূমিকা পলন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা দূর্বলের বিরুদ্ধে শক্তিমানের হাতিয়ার

আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক কোর্ট এসবের আসলেই কি কোনো বাস্তবতা আছে? বাস্তবে এগুলো কি আসলেই আন্তর্জাতিক না শক্তিমানের জন্য দুর্বলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হাতিয়ার? জাতিসংঘ! এটা কি আসলেই বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করে? আর শক্তিমানরাইবা একে কিভাবে দেখেন? আসলে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এসব আন্তর্জাতিক চুক্তির

তেমন পরোয়া করে না। আমেরিকা যখন সিরিয়ায় হামলা করল, তখন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্তোনিও গুতেরেস এই হামলার সমালোচনা করলেন। কারণ সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে অনুমোদন নেয়া হয়নি। অতএব তা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ছিল না। এই সমালোচনার উপর বোল্টন মন্তব্য করেছেন "Which some of us thought was ridiculous" তার এ কমেন্ট থেকে বুঝা যায়, আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ ইত্যাদি সংস্থগুলোকে আমেরিকান রাজনীতিকরা কিভাবে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখেন। রিডিকুলাস! তাদের কাছে এসবের কোনো মূল্যই নেই। এগুলো শুধু অনুগতদের সঠিকভাবে ম্যানেজ ও পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

ট্রাম্প-কিম আলোচনা

সিঙ্গাপুরে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে ট্রাম্পের মিটিং সেট করা ছিল। এজন্য "গুডউইল গেশচার" হিসেবে উত্তর কোরিয়া তিনজন আমেরিকান বন্দী মুক্তি দেয়। কিন্তু বিনিময়ে ট্রাম্প ও তার দল মিটিং ক্যানসেল করে দেন এবং সেটা টুইটার ব্যবহার করে করা হয়। তিনজন বন্দী মুক্তির বদলে উত্তর কোরিয়াকে কোনই লাভ দেয়া হয়নি। এখানে আমরা সামান্য ধারণা অর্জন করতে পারি, পাশ্চাত্য নেগোসিয়েশন পদ্ধতির ব্যাপারে। সেটা কিভাবে কাজ করে বা নেগোসিয়েশনে কোন ধরণের মানসিকতা কাজ করে থাকে। তাদের কাঙ্খিত বস্তু বা ডিমান্ড আগেই হস্তান্তর করলে, পরমুহূর্তে তারা চুক্তি, আলোচনা ভেঙে দিতে সময় নেয় না। তাছাড়া এতবড় একটি ডিপ্লোমেটিক বিষয় অফিশিয়াল সংবাদ সম্মেলন না করে টুইটারের একটি টুইটের মাধ্যমে বলে দেয় পশ্চিমের ডিপ্লোমেটিক লেভেল আজ কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। পরামর্শকদের সাথে আলাপ করে ট্রাম্প টুইট করেন,

»Based of the fact that dialogue has changed pertaining to North Korea and its denuclearization, I have respectfully asked my representives to inform North Korea to terminate the June 12 meeting in Singapore. While I very much look forward to meeting and negotiating with Kim Jong un perhaps we will get another chance in the future. In the meantime, I greatly appreciate the release of the 3 American who are now at home with families.«

আমেরিকার নেগোসিয়েশনে পরাজয়

এখানে আমেরিকার সাথে উত্তর কোরিয়ার নেগোসিয়েশনে পরাজয় বরণ দেখতে পাই আমরা। তবে পশ্চিমারা সবসময় যে দরকষাকষিতে বিজয় লাভ করেছে সেটা কিন্তু নয়। সমসাময়িক কালে আমরা যদি আমেরিকার সাথে আফগান তালেবানের নেগোসিয়েশনের স্ট্রেংথ দেখি, তাহলে দেখতে পাব তাদেরকে আমেরিকা এমনভাবে ধোকা দিতে পারেনি। ২০১৪ সালে আমেরিকান সৈন্য বো-বারগদাল ও পাঁচজন উচ্চপর্যায়ের তালেবান নেতার 'বন্দি বিনিময়ের' ঘটনায় আমরা দেখেছি, কিভাবে তালেবান সেটা হ্যান্ডল করেছিল। ঐ পাঁচ তালেবান নেতার ব্যাপারে ২০০৮ সালের রিপাবলিকানদের পক্ষের আমেরিকার প্রেসিডেনশিয়াল প্রার্থী জন ম্যাককেইন বলেছিলেন, the hardest of the hard-cor এবং high risk to the United States। যে থ্রেট বা রিস্ক কমাতেই মূলত আমেরিকার আফগানে যাওয়া, এমতাবস্থায় রিস্ক বাড়াতে পারে এমন ডিমান্ড মেনে নিতে হয়েছে তাদেরকে। এমনিভাবে ২০২০ সালে

ইন্ট্রা-আফগান আলোচনার পূর্ব মুহূর্তে প্রাইভেট প্লেনে করে তালেবান বন্দিদের মুক্তি দিয়ে কাতারে উড়িয়ে আনতে বাধ্য হয় আমেরিকা।
যাক, উত্তর কোরিয়ার নেতার সাথে এই মিটিং ক্যানসেল হলেও ট্রাম্প-কিম সম্পর্ক বেশ মজাদার হয়ে উঠেছিল। তবে এতে বাধ সাধে আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বোল্টন লিখেছেনঃ

> Kim sent Trump one of his famous love latters at the beginning of August, criticizing lack of progress since Singapore and suggesting that two of them get together again soon, Pompeo and I agreed such a meeting needed to be avoided at any cost.

অর্থ্যাৎ ট্রাম্পের কাছে লেখা চিঠিতে যা 'লাভ লেটার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিম জং আমেরিকান প্রশাসনের অযথা সময় ক্ষেপণের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। যার দায়ভার অবশ্যই আমেরিকান সরকারের। আর তারা যদি আসলেই উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আলোচনায় বসতেন।
বোল্টন বলেছেন, বিপরীতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন মিটিং যাতে না হয়। যাতে বৈরিতা জিইয়ে রাখা যায়। তবে ট্রাম্প নিজে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করতে ইচ্ছুক ছিলেন। যেমন বোল্টন লিখেছেন

> Trump wanted to meet Kim, and he didn`t want to hear anything contrary which probably why he didn`t want to hear me explaining that another meeting soon was a bad idea. Jhon, you have a lot of hostility. He said, to which I replied, the letter is written by the dictator

> of a rat-shit little country. He doesn`t deserve another meeting with you.

এই হলো আমেরিকানদের মানসিকতার বাস্তব নমুনা। অন্য দেশকে তারা কেমন সম্মান দেয়, এখান থেকে বুঝা যায়। বোল্টন বলেছেন, "rat-shit little country doesn`t deserve another meeting" এই নমুনা দেখার পরে যে কোনো রাষ্ট্র বা গোষ্ঠিকে এটা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আমেরিকার সাথে আলোচনায় বসার পূর্বে তাদের এই দর্পকে চূর্ণ করার বিকল্প নেই। সেটা না পারলে আলোচনায় নিশ্চিতভাবে সফলতা আসবে না।

ট্রাম্প-পুতিন আলোচনা ও আফগান ভীতি

একবার ট্রাম্পের সাথে পুতিনের মিটিংয়ের ভ্যানু নিয়ে রাশিয়া-আমেরিকার মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। যার যার পছন্দ বলছিলেন সবাই। রাশিয়া ভিয়েনা ও আমেরিকা হেলসিংকিকে ভ্যানু হিসেবে চাচ্ছিল। কিন্তু ট্রাম্পের হেলসিংকি পছন্দ নয়। কথা প্রসঙ্গে এটাও বেড়িয়ে আসে, ফিনল্যান্ড কোথায় সেটা ট্রাম্প জানতেন না। বোল্টন লিখেছেনঃ

> isn`t Finland kind of satellite of Russia? he asked. (later that same morning, Trump asked Kelly if Finland was part of Russia.) I tried to explain the history but didn`t get very far before Trump said he too wanted Vienna.

ওয়াও! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানেন না ফিনল্যান্ড সম্পর্কে। ফিনল্যান্ড কি স্বাধীন দেশ, না রাশিয়ার অংশ জানা নেই। হেলসিংকি কোথায়? ট্রাম্পকে ইতিহাস শিখাচ্ছেন বোল্টন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাধারণ জ্ঞানের এই অবস্থা হলে, সেদেশের জনগণের জেনারেল নলেজ কতটুকু নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। একবার সাক্ষাৎকার প্রদানকালে প্রকাশ পায়

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী গেরী জনসন সিরিয়ার অন্যতম প্রধান শহর আলেপ্পো চিনতে পারেন নি। অথচ ইরাক-সিরিয়ায় কি না করলো আমেরিকা। শুধু তাই নয় একটি জরিপে দেখা গেছে বিশ্ব সম্পর্কে কলেজ পড়ুয়ারাসহ অধিকাংশ আমেরিকানদেরই তেমন কোনো ধারণা নেই। সে দেশের জনতা উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান বা সিরিয়ার ব্যাপারে সামান্যই ধারণা রাখেন। সুদূরে থাকা ইরান, আফগানিস্তান বা ইয়ামান তাদের জন্য থ্রেট না-কি নিজের দেশে ঘাপটি মেরে থাকা ইয়াহুদী লবী তাদের জন্য হুমকি সেটা নিয়ে ভাবার মতো সক্ষমতার অভাব আছে। আসলে আমেরিকার জনগণ যদি সামান্য জেনারেল জ্ঞান আহরণ করত, কিছু নিরপেক্ষ নিউজ পড়ত, তাহলে বুঝতে পারত, মধ্যপ্রাচের বা এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো তাদের জন্য হুমকি নয়। বরং তাদের জন্য হুমকি আমেরিকার অভ্যন্তরে থাকা ইহুদী সিন্ডিকেট। আমেরিকাকে এই সিন্ডিকেট ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থে। সামনের দিনে আরো ব্যবহার করবে। ট্রাম্পের অনেক একক সিদ্ধানতই এই মুসাদ-জায়োনিস্ট সিন্ডিকেটের ভাল লাগেনি। তাই তারা ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাইডেনকে সাপোর্ট করেছে।

বোল্টন তার রাশিয়া সফর নিয়েও লিখেছেন, সেখানে সিরিয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার নীতির আলোচনাটি বেশ ইন্টারেস্টিং-

> on Syria, Putin asked, regarding our desire to see Iranian forces withdraw, who would accomplish that? this was one of those moment where Putin pointed at me and said I should tell Trump directly that the Russians didn`t need Iranian in Syria, and there was no advantage for Russia in having them there. Iran was pursuing its own agenda, given their goals in

> Lebanon and with the Shia, that had nothing to do with Russian goals, and was creating problems for them and Assad. Russian goal, said Putin, was to consolidate the Syrian state to prevent chaos like in Afghanistan, whereas Iran had broader goals.

এখানে আমরা রাশিয়ান পার্সপেক্টিভে সিরিয়ায় মূলত দুটি ধরণ ও কর্মপন্থা লক্ষ্য করছি। প্রথমত, রাশিয়া বলছে সিরিয়ায় ইরান তাদের নিজস্ব লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যটা কি? আসলে ইরান শুধু সিরিয়াতেই নয়, সাথে সাথে ইরাক, লেবানন, ইয়ামানসহ পুরো অঞ্চল নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে আঞ্চলিক সুপারপাওয়ার হওয়ার চেষ্টায় আছে। শুধুই আঞ্চলিক পাওয়ার হাউজ নয়, তাদের লক্ষ্য তারা পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্বের সেই শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে আনবে। এ লক্ষ্যে তারা আফগানিস্তানে আহমদ শাহ মাসুদ বা নর্দান এলায়েন্সসহ অন্যান্য গোষ্ঠিকে প্রক্সি বানিয়ে কাজ করেছিল। সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর ইরাকের নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের কাছে নিতে সক্ষম হয়েছে। লেবাননে শিয়া হিজবুল্লাহর মাধ্যমে ও ইয়ামানে হুতিদের মাধ্যমে তারা কাজ করছে।

সিরিয়াতেও তারা এজন্য নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টায় আছে। কিন্তু সিরিয়াতে তাদের প্রধান বাধা সুন্নি ইনসার্জেন্সি দলগুলো। এদের মোকাবেলার জন্য মার্সেনারিদের আফগানিস্তানসহ অত্র অঞ্চল থেকে তারা জড়ো করে, সুন্নিদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। আর এই পুরো ব্যাপারটা মনিটর করছিলেন কাশেম সুলাইমানী। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যেমন তার নিজের এজেন্ডা অনুযায়ী কাজ করছে, তেমনি রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু তিনটি দলেরই একটি কমন

গ্রাউন্ড রয়েছে। সেটা হল সুন্নি ইনসার্জেন্সি বিরোধী লড়াই। এইজন্য ইরানকে আমেরিকা সিরিয়ায় সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমেরিকা বুঝতে পারছিল গেইম তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এই জঠিল সমস্যার সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টায় ছিল তারা। আর তাই রাশিয়ার প্রতি তাদের সন্দেহ ও কনসার্ন। রাশিয়া কি ইরানকে সাহায্য করছে? এজন্য উক্ত মিটিংয়ে রাশিয়ার পুতিন পরিষ্কার করে দিলেন যে, সিরিয়ায় ইরান ও রাশিয়ার লক্ষ্য ভিন্ন। আমেরিকার এই ভীতির একটি প্রকাশ আমরা দেখেছি কাশেম সুলাইমানিকে হত্যার মাধ্যমে। কারণ তারা দেখছিল, কাশেম সুলাইমানির নেতৃত্বে সিরিয়া ও ইরাকে ইরানের প্রভাব বাড়ছে এবং আমেরিকার প্রভাব কমছে।

আফগানিস্তানে বিশৃঙ্খলা ও উম্মাহ যুদ্ধের উত্থানঃ

দ্বিতীয় যে বিষয়টা পুতিন বলেছেন সেটা হল "to prevent chaos like in Afghanistsn."

আসলে আফগানিস্তানে কি হয়েছিল?

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। সেই সময় আবির্ভাব ঘটে আফগান মুজাহিদীন আন্দোলনের। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ফলাফল নিয়ে আসে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন নজীর দেখা যায়নি।

মুজাহিদীনরা অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের জন্য পুরো মুসলিম উম্মাহর কাছে আহবান জানান। এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদের সীমানা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। জন্ম নিয়েছিল নতুন এক মতাদর্শিক যুদ্ধের। জন্ম না বলে পূণর্জন্ম বলা যায়।

এ ব্যাপারে নরওয়েজিয়ান ডিফেন্স রিসার্চ এসটাবলিশমেন্টের থমাস হেগম্যার লিখেছেন-

> “The Afghan Mujahidin neither presented not saw themselves simply as a nationalist movment in need of external support. Instead, the external messaging emphasized the global ramifications for the war and the Afghan people`s membership in wider transnational communities, especially that of the umma- the Muslim nation. To Muslim audiences, the mujahidin played up Adghanistan`s centuries-old connections to the vest of the Muslim world.” (page-148, the caravan)

অর্থ্যাৎ মুজাহিদীনরা এই আন্দোলনকে মুসলিম উম্মাহর সামনে ‘উম্মাহর যুদ্ধ’ হিসেবে উপস্থাপন করেন। উম্মাহর সাথে আফগানিস্তানের খোরাসান কানেকশন তুলে ধরেন। এতে যা হবার তাই হয়েছিল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যখন নীরব, তখন সাধারণ মুসলিম জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়। পুরো উম্মাহর জাগরণের জন্য এ যুদ্ধ নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ইউনিউন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুতিন যখন বলছিলেন, “to prevent chaos like in Afghanistsn.” তিনি এটাই বুঝিয়েছিলেন।

কারণ সিরিয়ার সুন্নি মিলিশিয়াদের মাধ্যমে একইভাবে উম্মাহ চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল। মুসলিমরা দলে দলে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হচ্ছিলেন

আর্থিক, মেডিকেল ও মিলিটারি সাহায্য নিয়ে। রাশিয়ার জন্য যা অবশ্যই একটি ভীতিকর ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। তবে সিরিয়ায় নিরপরাধ মানুষের উপর ফসফরাস বোমাসহ ভয়ঙ্কর সব বোমা ফেলে রাশিয়া কিছুটা আফগানিস্তানে নাস্তনাবুদ হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। সেটা আমরা এখনো প্রত্যক্ষ করছি।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান নিয়ে পুতিনের মত

পুতিনের সাথে বোল্টনের আলোচনায় আরেকটি বিষয় উঠে এসেছিল। তিনি লিখেছেন-

> On Iran, he scoffed at our wihtdrawal from the nuclear deal, wondering, now that the United State had wihtdrawn, what would happen if Iran withdrew? Israel, he said could not conduct military action against Iran alone because it didn`t have the resources or capabilities, especially if the Arabs United behind Iran."

ইরানের সাথে ডিল করল ওবামা প্রশাসন। ট্রাম্প প্রশাসনের তা ভালো লাগেনি। তাই ক্যানসেল করে দিল। আসলে পশ্চিমের রাজনীতিতে চুক্তিকে সামান্যই মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এখানে পুতিনের যে কনসার্ন- যদি আরব দেশগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে গিয়ে ইরানের পক্ষে একতাবদ্ধ হয়ে যায়? এই ভাবনা অমূলক। কারণ ইরানের এমন নৈতিক শক্তি নেই যে, তারা ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে। তবে এখানেও জায়নিস্ট এলায়েন্স সামান্যতম সন্দেহ বা সম্ভাবনা রাখতে চায়নি। তারা আরব দেশগুলোর সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে বেশ কিছুদিন

ধরে। যাতে সামান্যতম সম্ভাবনাও অবশিষ্ট না থাকে।

ন্যাটোর ৫ নাম্বার আর্টিকলঃ

ভেবে দেখার মতো একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন বোল্টন। সেটা হল NATO বা Nort Atlantic Treaty`s এর আইকনিক ৫ নাম্বার আর্টিকল নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছেঃ "An armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all." বোল্টন লিখেছেনঃ "This provision is actually less binding than its reputation." আসলেই তো! ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক। কিন্তু ন্যাটোর আরেক সদস্য আমেরিকা তুরস্কের বিরুদ্ধে ও সেদেশে বর্তমান ক্ষমতায় থাকা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যায়। কিন্তু এতে ন্যাটো কোনো কনসার্ন দেখায় না। মূল কথা গুরুত্বপূর্ণ যেসব অ্যালায়েন্স হয়েছে, তার বেশিরভাগই পশ্চিমাদের স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগোনোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। ন্যাটোর এই ৫ নাম্বার আর্টিকল শুধুমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছিল। সেটা নাইন ইলিভেনের পরে আফগানিস্তান হামলার জন্য। আর ঐ হামলায় ন্যাটোর অন্যতম সদস্য তুরস্কও জড়িত ছিল।

"আই লাভ অ্যাঞ্জেলা" ট্রাম্প

পশ্চিমের রাজনীতিতে মহিলাদেরকে এখনও সেই সম্মান দেয়া হয়নি যা একজন মহিলার প্রাপ্য। সমানাধিকারের মুলা ঝুলিয়ে রাখলেও সুযোগ পেলেই তারা মেয়েদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। যেমন ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ন্যাটোর সামিটের একটি উদাহরণ আনা যেতে পারে। বোল্টন লিখেছেন-

> "as we left Merkel was speaking. Trump went up to her to say goodbye, and she rose to shake hands. Instead, he kissed her on both cheeks, saying, "I love Angela." The room broke into applause."

অর্থ্যাৎ জার্মানির মতো একটি শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। তাকেও একজন পুরুষের হাতে জনসমক্ষে শুধুমাত্র মেয়ে হওয়ার কারণে অপদস্ত হতে হল। মার্কেল তো হাত মিলাতে চেয়েছিলেন। তিনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে কি ট্রাম্প এভাবে দু গালে চুমু খেয়ে বলতেন "আই লাভ অ্যাঞ্জেলা"? বলতেন না। আর পুরো সামিটের লোকেরাও এভাবে হেসে উঠতো না।

আমেরিকা-ইসরাইল বন্ধুত্ব

ন্যাটো সামিটের পরে ট্রাম্প লন্ডন সফরে আসেন। এখানকার অবস্থানের সময়কালের বেশ কিছু বিবরণ দিয়েছেন বোল্টন। তবে যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে নজরে পড়েছে, সেটা হল আমেরিকার সাথে ইসরাইলের সম্পর্কের পর্যায়। অন্য দেশের নেতৃত্বের সাথে আলাপের পূর্বে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বেশ প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু শুধু ইসরাইলের লোকদের সাথে আলাপের প্রস্তুতি নিতে হয় না। এবং মনে হচ্ছিল বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপডেট জানাতে চাইলে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী তাদের রক্ষাকর্তা আমেরিকার দরবারে যেকোনো মুহূর্তে ফোন কল

দিতে পারেন। বোল্টন লিখেছেন-

> "we stayed at Turnberry until Sunday, Trump played golf, and we had several calls with Israeli Prime Minister Netanyahu"

অর্থ্যাৎ ট্রাম্পের এই সফর অবস্থায়ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বারবার কল দিচ্ছিলেন। সেসময় তাদের আলোচনার বিষয়সস্তু কি ছিল? বোল্টন লিখেছেন- "the key subject was Netanyahu`s recent meeting with Putin, and particularly what they had discussed about Syria." সিরিয়া নিয়ে পুতিনের সাথে কি আলাপ হলো সেটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে জানানোর জন্য বারবার কল দিচ্ছিলেন নেতানিয়াহু। বসকে তো জানাতে হবে আগে। সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতি ইসরাইলের মাথাব্যথার কারণ। কিন্তু পুতিন জানালেন যে, তারা ইরানকে সাপোর্ট করছেন না। রাশিয়া নয়, বরং ইদলিবের সুন্নি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমনের জন্য আসাদ ইরানের সহযোগিতা নিচ্ছে। তবে হ্যা, সুন্নিদের সাথে যুদ্ধের জন্য আসাদ যেন এমন অস্ত্র আমদানি করতে না পারে যা ইসরাইলের জন্য হুমকি হবে সে ব্যাপারে তারা সজাগ দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। অর্থ্যাৎ ইসরাইলকে টার্গেট করতে পারে এমন অস্ত্র সিরিয়ার থাকা উচিত নয়। ইদলিবে যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়েও যেন এমন অস্ত্র সিরিয়া আমদানি না করে সে ব্যাপারে তারা একমত।
অন্য ইস্যু ছিল গোলান হেইটে স্থায়ী সীমান্তের ব্যাপারে ইসরাইলের প্রেসারের ব্যাপারটা। এই স্থানকে তারা সরাসরি সিরিয়া-ইসরাইল বর্ডার হিসেবে দেখতে চায়।

> "the elimination of the UN disengagement force and area of Separation. and returning to

a normal border situation."

একসময় উসমানী খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিরিয়ার গোলান হাইটসের বেশিরভাগ এলাকা ১৯৬৭ সালে ইসরাইল জোরপূর্বক দখল করে নেয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় আরবরা সেটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। ইসরাইলীরা সেখানে নতুন বসতী স্থাপন শুরু করে। এ নিয়ে উত্তপ্ত থাকা সেই এলাকায় সিরিয়া ও ইসরাইল জাতিসংঘের দেয়া শর্ত বরাবর ভেঙ্গে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিল। সেটা থেকে নিবৃত্ত করতে জাতিসংঘের মাধ্যমে ইসরাইল-সিরিয়া এক চুক্তি সাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী গোলান হাইটসে দু'পক্ষ পেছনে সরে গিয়ে একটি বাফার জোন তৈরি করে। এই জায়গাটাতেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী অবস্থান করে আছে। প্রাথমিকভাবে এই বাফার জোন ইসরাইলের পক্ষে গেলেও পরবর্তীতে ইসলামী মিলিশিয়ানদের উত্থানে সেটা ইসরাইলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত ২০১৩ সালে যখন আল-নুসরা ফ্রন্ট সেই এলাকার কিছু অংশ দখলে নিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে আটক করে, তখন ইসরাইলের মাথা ব্যথা আরো বেড়ে যায়। এজন্য ইসরাইল চাচ্ছিল এই বাফার জোন থাকবে না। বরং সরাসরি ইসরাইল-সিরিয়া বর্ডার থাকবে। আর এই নিয়েই ট্রাম্পের সাথে আলোচনা।

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সাত নাম্বার অধ্যায়ে এসে বোল্টন লিখেছেন-

"war by radical Islamist terrorists against the United States began long before 9/11 and will continue after. you can like it or not, but it is reality."

অর্থ্যাৎ আমেরিকার বিরুদ্ধে ইসলামী মৌলবাদীরা ৯/১১ এর অনেক আগে থেকেই যুদ্ধ শুরু করেছে। যুদ্ধ যে ৯/১১ এর পূর্ব থেকে চলছে তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এই যুদ্ধ ইসলামী মৌলবাদীরা শুরু করেনি। এটা শুরু করেছে আমেরিকা। একের পর এক মুসলিম উম্মাহর বুকে ছুরি চালিয়েছে আমেরিকা। মুসলিমদের ঘরে ঢুকে সকল প্রকার জুলুম নিপীড়ণ করেছে এবং করে যাচ্ছে এই শক্তি। তাহলে কিভাবে আমরা বলতে পারি এটা মৌলবাদীরা শুরু করেছে।
ফিলিস্তিনের বিপক্ষে কারা ইয়াহুদিদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রটেকশন দিয়ে সাহায্য করেছে? এই আমেরিকা। কারা মুসলমানদের সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে? এই আমেরিকা। তারা বেইস করেছে মক্কা-মদিনার দেশে। এসব কিছুই মৌলবাদীদের উস্কানি দিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, এই যুদ্ধ চলতে থাকবে অনেক অনেক কাল যাবত। পশ্চিমারা যাকে নাম দিয়েছে "Endless War" এটা এখনি শেষ হচ্ছেনা। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার চলে আসায়ও শেষ হবে না।

আমেরিকার খৃস্টান সমাজ

অনেকের ধারণা দুনিয়ার মানুষ দিন দিন ধর্মহীন হচ্ছে। ধর্মের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট কমে যাচ্ছে। তবে বোল্টনের বর্ণনা করা একটি কাহিনী এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু জানান দেয়। ২০১৬ সালে যখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিরুদ্ধে আমেরিকায় বসবাসরত ফতেহুল্লা গুলেনের নেতৃত্বে মিলিটারি ক্যু সংঘটিত হয়, তাতে অ্যান্ড্রু ব্রানসন নামক এক খৃস্টান পাদ্রীর অংশ নেয়ার অভিযোগ উঠে। তখন তুরস্ক তাকে গ্রেফতার করে। এতে আমেরিকার খৃস্টান সমাজ খুবই রাগান্বিত হয়। তারা আমেরিকা সরকারকে চাপ দিতে থাকে ব্রানসনকে মুক্ত করার জন্য। বোল্টন বলেছেন-

> "America`s entire Christian Community was upset about this one pastor; they were going crazy."

আমেরিকার জনগণ যদি দিন দিন আরও বেশি মৌলবাদী খৃস্টান না হতো, তাহলে কি ট্রাম্প প্রশাসনকে এই বিষয়টাতে এতো সিরিয়াস হতে হতো? হতো না। তাই কিভাবে ট্রাম্পকে বারবার এরদোয়ানের সাথে এজন্য যোগাযোগ করতে হয়েছে সেটা বোল্টন বর্ণনা করেছেন। এমনকি প্রলোভনও দেখিয়েছেন ট্রাম্প। যেমন Halkbank ইস্যু। তুরস্কের সরকারি ব্যাংক Halkbank এর সিনিয়র অফিসিয়াল মুহাম্মাদ আতিল্লাহর বিরুদ্ধে চলা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের সমাধান করে দেবেন বলে বলেছেন।

> "This ongoing criminal investigation threatened Erdogan himself because of allegation he and his family used Halkbank for personal purpose, facilitated further when his son-in-law became turkey`s finance minister."

এরদোয়ানকে ট্রাম্পের মিথ্যা আশ্বাস

Halkbank কেসের জন্য এরদোয়ান ও ট্রাম্প ব্রানসনের জন্য দরকষাকষি করছিলেন। ডিসেম্বরে যখন দুই নেতার জি-টোয়েন্টি সামিটে দেখা হলো, তারা এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলেন। এরদোয়ান তখন ট্রাম্পকে Halkbank এর উপর একটি ফাইল দেখালেন।

> "Which Trump did nothing more than flip through before declaring he beliveved

Halkbank was totally innocent of violating US Iran sanction."- বোল্টন লিখেছেন।

অর্থ্যাৎ ট্রাম্প ফাইলের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলেন, কিন্তু কোনো কিছু পড়ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল না। তারপর তিনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন আসলেই তো Halkbank নির্দোষ। এটা তিনি বিশ্বাস করেন। অথচ কেইস আমেরিকান কোর্টে তখনও চলছে। ট্রাম্প বললেই তা নির্দোষ প্রমাণিত হবে না। এরপর ট্রাম্প এরদোয়ানকে বললেন 'চিন্তা করবেন না, আমি এটা দেখবো। কোর্টে দায়িত্বে থাকা বর্তমানের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট প্রসিকিউটর আমার লোক নয়, ওবামার লোক। যখনই আমার লোক সেখানে বসবে, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বোল্টন লিখেছেন, "of course this was all nonsense" অর্থ্যাৎ এটা ট্রাম্পের ব্লাফ ছিল। এখানে তিনি এরদোগানকে প্রলোভন দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন।

ফতেহুল্লাহ গুলেনকে তুরস্কে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রলোভনও দেখিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু কোনোটাই বাস্তব ছিল না। অ্যান্ড্রু ব্রানসনের জন্য তারা তুরস্কের উপর সাংশন আরোপ করে অর্থনীতিতে ধস নামিয়েছিল। অবশেষে তারা ব্রানসনকে মুক্ত করেই নিয়ে যায়।

এরদোয়ান আইএসের খেলাফত ধ্বংস করতে চাইতেন

এখানে বোল্টন একটি তথ্য সংযুক্ত করেছেন সেটা হলোঃ "Erdogan was purportedly interested in destroying the caliphate." প্রশ্ন জাগে এরদোয়ান কেন আইএসের খেলাফত ধ্বংস করতে চাইতেন। এর একটি উত্তর হতে পারে এই যে, আইএসের সীমান্ত ছিল তুরস্কের সাথে। এ কারণে তুরস্কে মৌলবাদী ইসলামিস্টদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছিল। যদিও আইএসের তুরস্ক সীমান্তে অবস্থানের কারণে তুরস্ক অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হচ্ছিল, কিন্তু এরপরেও

সেটাকে ধ্বংস করতে চাওয়াই বলে দেয় এখানে মতাদর্শিক স্বার্থ জড়িত। আরেকটি কারণ হতে পারে, সৌদির পর মুসলিম বিশ্বের মানুষ তুরস্ক ও এরদোয়ানের নেতৃত্বের প্রতি অনেকটাই বন্ধু ভাবাপন্ন। কিন্তু আইএসের খেলাফতের স্থায়িত্ব সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। শুধু আইএস নয়, আমার মতে অন্য যেকোনো ইসলামপন্থী মিলিশিয়া, যেমন হাইয়্যা তাহরির আল-শাম এর মতো দলকে এরদোয়ান একই কারণে উন্নতি (graw) করতে দিতে চাইবেন না। যদি দেখা যায় সাহায্য করছেন, তাহলে সর্বাবস্থায় প্রক্সি করে রাখতে চাইবেন। একই আচরণ আমরা দেখেছি পাকিস্তানের কাশ্মীর পন্থী মিলিশিয়াদের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ ডোনাল ট্রাম্প-এরদোয়ান ফোনে কথা বলেন। ট্রাম্প তুরস্কের চাহিদা কি সেটা জানতেন। বোল্টন লিখেছেনঃ

> "Trump new turkey`s expectations regarding the YPG (a Syrian Kurdish Militia, part of the opposition Syrian defense forces) and the FETO (Gulenist) terrorist network, which Erdogan characterized as threats to Turkish national security."

অর্থ্যাৎ ট্রাম্প ও আমেরিকা জানে তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কুর্দিশ YPG ও ফতেহুল্লাহ গুলেনের দল দায়ী। তারপরেও তারা তাদের ন্যাটো সহযোগীর বিরুদ্ধে গিয়ে গুলেন ও YPG কে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। গুলেনকে তারা আমেরিকায় আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। বোল্টন লিখেনঃ “America was continuing to train YPG forces, including up to 30-40,000 new recruits.” অর্থ্যাৎ আমেরিকা কুর্দিশ ফোর্সকে ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছিল।

এই ফোনে কথা বলা অবস্থায়ই এরদোয়ান এই দ্বৈতনীতির কথা

ট্রাম্পকে বললেও কে শুনে কার কথা। শক্তি যার আইন তারই চলে। তবে একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোটে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ছোট দেশের তেমন কোনো ফায়দা হয় না। বরং এসব জোট তৈরিই হয় ছোট ছোট দেশকে জোটের মুলা দেখিয়ে ব্যবহার করা।

সিরিয়ায় সুন্নি যুদ্ধাদের, বিশেষ করে আইএসকে পূর্ণরূপে নির্মূলের পূর্বে আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার অনেকে মতো ফ্রান্সের জন্যও ছিল পীড়াদায়ক। পীড়াদায়ক ছিল ইসরাইলের জন্যও। ইসরাইল চাচ্ছিল আমেরিকা সেখানে সুন্নি মিলিশিয়াদের সাথে যুদ্ধ করে ইসরাইলের থ্রেট পরিষ্কার করবে। বোল্টন লিখেছেনঃ

> "Israel`s ambassador, Ron Dermer told me that this was the worst day he had experienced thus far in the Trump administration."

অর্থ্যাৎ বোল্টন বলেছেন ইসরাইলের এম্বাসেডর তাকে বলেছেন, সিরিয়া থেকে আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার ট্রাম্পের জামানার সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য। এজন্যই আমরা দেখি জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণাসহ ইসরাইলের জন্য অনেক কিছু করার পরেও ২০২০ সালের ইলেকশনে ইসরাইলীরা ট্রাম্পকে কেন সমর্থন করেনি। মনে হয় ট্রাম্প থেকে যা নেয়ার তারা সেটা নিয়ে নিয়েছে। এখন তার চেয়েও worst বাইডেনকে তাদের প্রয়োজন।

হট ইস্যুঃ আফগানিস্তান

বোল্টন আফগান ইস্যুতে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ

> "This wasn`t a war about making Afghanistan, Iraq, Syria or any other country nicer, safer

> places to live – this was about keeping America safe from another 9/11 or even worse."

অর্থ্যাৎ আমেরিকা বিভিন্ন দেশে যে যুদ্ধে যায়, সেটা সেই দেশের ভালো করার জন্য যায় না। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মেয়েদের ফ্রি করার শ্লোগান ইত্যাদি সত্য নয়, মেকি। বরং আমেরিকা চায়, যাতে তার দেশে আরেক ৯/১১ না হয়। এখানে তাদের পূর্ণ কৌশলটা ভুল। কারণ ভিন্ন দেশে যেহেতু সেদেশের ভালোর জন্য যাওয়া হয় নি, তাই সেইসব দেশে আমেরিকান সৈন্যরা যা ইচ্ছা তাই করে থাকে। এতে বরং বিশ্বে আরো বেশি আমেরিকা বিরুধী সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়। আমেরিকার নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে। এটাই গত দশকগুলোতে দেখা গেছে। কিন্তু আমেরিকা এ থেকে শিক্ষা নেয় নি। এটা তাদের প্রশাসনের ভেতরের মাথাওয়ালাদের মগজে যাচ্ছিল না। কিন্তু ট্রাম্প বুঝতে পেরেছিলেন বিষয়টা। ট্রাম্পের কিছু মন্তব্য পর্যালোচনা করলে সেটাই বুঝা যায়।

একটি দেশে যখন ইনসার্জেন্সি বা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়, তখন ক্ষমতাসীনরা এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি দাড় করায়, যাদের মাধ্যমে ঐ প্রতিরোধ আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের রাজাকার-আলবদরদের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তো আমেরিকাও বিভিন্ন দেশের মতো ইরাক ও আফগানিস্তানে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি দাড় করিয়েছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে বিফলে গেছে। বোল্টন লিখেছেন-

> "US failing during the course of the war, - the collapse of the beloved counter insurgency strategy that had failed in both Afganistan and Iraq"

অর্থ্যাৎ আফগানিস্তানের যুদ্ধে পদে-পদে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে আমেরিকাকে। কাউন্টার ইনসার্জেন্সি কৌশলও ফল দেয়নি।

তবে আমেরিকান জেনারেলরা প্রশাসনকে অযথা আশা দিয়ে যেতেন। যেমন মাইক পেন্স জন বোল্টনকে বলেন, ম্যাটিস নাকি এখনও যুক্তি দেখান আমরা মিলিটারিলি আফগানিস্তানে উন্নতি করেছি। বোল্টন লিখেছেন-

> "Pence knew as well as I that Trump didn`t believe that, and there was substantial evidence mattis was wrong."

অর্থ্যাৎ, আফগানিস্তানে আমেরিকান মিলিটারি উন্নতি করছে, ম্যাটিসের এই কথা ট্রাম্প বিশ্বস করেন নি। আর এই না করার পেছনে কারণ পরিস্কার। আমেরিকা আফগানিস্তানে পরাজিত হচ্ছে।

আফগানিস্তান, ব্যর্থতার ইতিহাস

নভেম্বরের ৮ তারিখ আমেরিকার উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের জন্য একটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছিলেন পেন্স, ম্যাটিস, ডানফোর্ড, কেলি, পম্পেও, কোটস, হাসপেল, বোল্টনসহ অনেকেই। সেই মিটিংয়ে ট্রাম্প বলেন, “We are being beaten, and they knew they`re beating us” অর্থ্যাৎ তালেবানরা আমাদের একের পর এক পরাজিত করছে। এবং তারা জানে তারা আমাদের পরাজিত করছে।

“We`ve lost everything. It was a total failure. It`s a waste. It`s a shame. All the causalties. I hate talking about it” অর্থ্যাৎ আমরা সবকিছু হারিয়েছি এই যুদ্ধে। সম্পূর্ণ এক ব্যর্থতার ইতিহাস এটা। লজ্জা! এতো এতো আহত-নিহত। এ ব্যাপারে কথা বলতেই আমি ঘৃণা করি।

ট্রাম্প তারপর মাদার অফ অল বম্ব (MOAB) এর উদাহরণ টেনে

বলেন, কী হয়েছে এত শক্তি ব্যবহার করার পরেও?

ম্যাটিস বললেন, আইএস-তো এখনো আফগানিস্তানে আছে। ট্রাম্প তখন বললেন, রাশিয়াকে তাদের সাথে ডিল করতে দাও "We`re seven thousand miles away, we`ar still the target, they`ll come to our shores, that`s what they all say." it`s a horror show." অর্থ্যাৎ সাত হাজার মাইল দূরে থাকার পরেও আমরা তাদের টার্গেট। এ যেন হরর মুভি।

কোট কিছু বললে ট্রাম্প বলেন, "this was done by a stupid person name Goerge Bush" অর্থ্যাৎ আমেরিকার আফগান যুদ্ধ জর্জ বুশ নামক এক স্টুপিড লোকের দ্বারা শুরু হয়েছিল। ট্রাম্প হয়তো আল-কায়দার ফেমাস কৌশলের ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। আল-কায়দার নাইন ইলেভেনের হামলার উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রক্সি হিসেবে যুদ্ধ করতে থাকা আমেরিকাকে সরাসরি মুসলিমদের সাথে

যুদ্ধে নামতে বাধ্য করা। তাদের এই কৌশলের ফাঁদেই পা দিয়েছিলেন জর্জ বুশ। ট্রাম্প বলেছিলেনঃ " "Millions of people killed, trillions of dollars, and we just can`t do it. Another six months, that`s what they said before, and we`re still getting our assess kicked." অর্থ্যাৎ মিলিয়ন মানুষ নিহত হলো, ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হলো, কিন্তু আমাদের বিজয় এলো না। বরং তালেবানরা আমাদের জুতাপেটা করতেই থাকলো। আর এদিকে আমাকে বলা হচ্ছে, আর ছয় মাস সময় দেন। তালেবানরা আর টিকতে পারবে না। হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু ছয় মাস তো শেষ হয় না। এরপর ট্রাম্প বলেন, আফগানিস্তানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতো খারাপ যে, স্কুল শিক্ষকদের প্রতিদিন হেলিকপ্টারে আনা-নেয়া করতে হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতো খারাপ যে, তাদের একা একা যাওয়া মারাত্মক হুমকি।
এ নিয়ে আরও বেশ আলোচনার পর পম্পেও বলেন, এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আমরা আফগান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। কিন্তু "the story is that we won`t get victory," আর্থ্যাৎ পরাজয় স্বীকার করে বের হয়ে আসতে হবে। বিজয়ের কাহিনী থাকবে না। উত্তরে ট্রাম্প বললেন " that`s Vietnam." অর্থ্যাৎ ভিয়েতনামে আমরা যেভাবে পরাজিত হয়েছিলাম, ঠিক একইভাবে আফগানিস্তানে পরাজিত হয়েছি সবার জানা কথা।
ট্রাম্প বললেনঃ কতদিন লাগবে বের হয়ে আসতে? পম্পেও বললেন, ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এত সময় লাগবে শুনে ট্রাম্প অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন-

> "How do we get out without our guys getting killed? How much equipment will we leave? Dunford spoke for the first time, saying, "not much." "how do we get out? asked Trump. "we will build a plan." said Dunford."

অর্থ্যাৎ আমরা যখন বের হয়ে আসবো, তখন তালেবান আমাদের তাড়া করে হত্যা করতে পারে। তাহলে নিরাপদে বেরিয়ে আসবো কিভাবে? আর আমাদের কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসতে হবে? উত্তরে ডানফোর্ড বলেন, তেমন বেশি অস্ত্র ফেলে আসতে হবে না। বের হওয়ার জন্য আমরা প্লান তৈরি করব। ট্রাম্প তাদেরকে ভ্যালেন্টাইন ডে পর্যন্ত সময় দেন।

> "One month later, after another report we were losing ground to the Taliban, Trump exploded again: I should have followed my instincts, not my generals."

অর্থ্যাৎ একমাস পরে যখন রিপোর্ট এলো তালেবানদের হাতে আমেরিকা পরাজিত হচ্ছে, ট্রাম্প রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন- আমাকে জেনারেলদের কথা না শুনলেই ভালো হত। অর্থ্যাৎ সৈন্য ফেরত না এনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ।

যাক আফগান থেকে সৈন্য ফেরত নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রেসকে সম্মানজনক কি বলা যায়। এ নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বোল্টন পরামর্শ দিলেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেটা অ্যাড্রেস করলেই হবে।

ট্রাম্প বললেনঃ “We`ll say were going to flatten the country if they allow attacks from Afghanistan” অর্থ্যাৎ আমরা বলব তারা যদি আমেরিকার উপর সন্ত্রাসী আক্রমণের সুযোগ করে দেয়, আমরা আফগানিস্তানকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব। তখন বোল্টন বললেন, এটা পুরনো বুলি। আমাদের আরো ভাল কিছু একটা বলতে হবে। যাক আলোচনায় ঠিক হলো ট্রাম্প এরকম বক্তব্য দেবেন-

"we`ve done a great job and killed a lot of bad people. now we`re leaving, although we will leave our counter-terrorism platform behind."

অর্থ্যাৎ অনেক খারাপ লোককে হত্যা করে বেশ ভলই কাজ আঞ্জাম দিয়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি, তবে সেখানে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি রেখে যাচ্ছি। সবাই জানেন কি গ্রেট কিলিং জব তারা আঞ্জাম দিয়েছেন। ড্রোন স্ট্রাইক ও নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা সেই গ্রেট জব আঞ্জাম দিয়েছেন। যে খারাপ লোকদের মারার জন্য তারা গিয়েছিলেন, তারা তো এখনো আছে। তাদের সাথেই আলোচনা করছে আমেরিকা। আর এটাও সকলে জানেন যে, আমেরিকা এমনি এমনি যাচ্ছে না। বরং যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর যে কাউন্টার টেরারিজম প্ল্যাটফর্মের কথা বলা হয়েছে, সেটা হল পেন্টাগনের ব্ল্যাকওয়াটারকে দাযিত্ব দেয়া। ব্ল্যাকওয়াটারের মাধ্যমে তারা চেয়েছিল মার্সেনারিদের একটা গ্রুপ রেখে আসার জন্য। এই ব্ল্যাকওয়াটার ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর নৃশংসতা চালিয়েছিল। কিন্তু তালেবানরা আমেরিকার সেই প্লানটাও ভন্ডুল করে দেয়। কাবুলের ভেতরে অত্যন্ত নিরাপদ কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে তারা ব্ল্যাকওয়াটারের নেতাদের হত্যা করে।

এরপর আলোচনা চলে, মুখরক্ষার জন্য বিশ্ববাসীকে কি বলা হবে? ট্রাম্প জিজ্ঞেস করলেনঃ “What`s a win in Afghanistan?”

তখন ম্যাটিক বললেনঃ “Let`s say we`re ending this war, not that we`re withdrawing.”

অর্থ্যাৎ আমরা বলতে পারি আমরা যুদ্ধের সমাপ্তি টানছি। কারণ আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। আমরা বলবনা, আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করছি।

ট্রাম্প বললেন, সাথে এটাও যুক্ত করা যায়-

"We have been there for eighteen years. We did a great job. if anybody comes here, they

will be met like never before."

অর্থ্যাৎ আমরা সেখানে ১৮ বছর ছিলাম। ভালোই করেছি আমরা। এখন কেউ যদি আমাদের দেশে হামলা করে, তাদেরকে এমন জবাব দেয় হবে, যা তারা কল্পনাও করে নি। অর্থ্যাৎ সেই পুরনো বুলি, যা এখন অনেক এক্টরদের কাছে আর গুরুত্ব রাখে না। আমেরিকা তার পূর্বের সম্মান হারিয়েছে, যা এখনও তারা অনুভব করছে না। এটাই সেই সম্মান, একটি রাষ্ট্রকে যা বিশ্ব দরবারে সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

ট্রাম্প ম্যাটিসকে বললেন, "I gave you what you asked for. unlimited authority, no holds barred. You`re losing. You`re getting your ass kicked. You failed." অর্থ্যাৎ তোমাকে যা বলেছ দেয়া হয়েছে। যা ইচ্ছা ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমিতো শুধুই পেছনে লাথি খাচ্ছো। তুমি ব্যর্থ হয়েছ। আসল কথা হল, সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স একা লাথি খাচ্ছেন না; বরং আফগানিস্তানে পুরো আমেরিকান প্রশাসন লাথি খাচ্ছে। তারা ব্যর্থ হয়েছে।

ম্যাটিস বললেন, "Can we delay (the withdrawal), so we don`t lose more men and diplomats?" অর্থ্যাৎ সৈন্য প্রত্যাহার কি একটু দেরিতে করা যায়? যাতে আমরা আরও সৈন্য ও ডিপ্লোমেটদের না হারাই। নিরাপদে যাতে প্রত্যাহার সম্ভব হয়।

ট্রাম্প বললেনঃ "We can`t afford it. we have failed." সম্ভব না। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অর্থ্যাৎ ম্যানপাওয়ারের আর লস বহন করা সম্ভব হবে না।

তখন ডানফোর্ড বললেন "There was no way to withdraw everyone safely in the time frame Trump wanted." অর্থ্যাৎ ট্রাম্পের বেধে দেয়া এই স্বল্প সময়ে নিরাপদে সবাইকে নিয়ে ফেরত আসা সম্ভব নয়।

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, তালেবানের সাথে আমেরিকার চুক্তি করার কি

দরকার ছিল? জাস্ট সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে আসলেই তো পারে। তাদের জন্য; মাঠে অবস্থা খুবই খারাপ। শুধুমাত্র একটি গাড়ি নিয়ে আমেরিকান সৈন্যরা টহলে বের হতে সাহস করেন না। গাড়ির বহর নিয়ে বের হতে হয়। জরুরি কাজে হেলিকপ্টার দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। বড় বড় আমেরিকান কর্মকর্তাদের গোপনে সফরে আসতে হয়। এসবই রাজধানী কাবুলের অভ্যন্তরের নিরাপত্তার অবস্থা। আর রাজধানীর বাইরের অবস্থা তো গরম তেলে বসে থাকার মতো।

ডিসেম্বরের ২০ তারিখ ম্যাটিস পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পূর্ব তিনি পম্পেওর কাছে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে পাবলিক স্টেটমেন্টের ড্রাফট কপি হস্তান্তর করে যান। বোল্টন লিখেছেন-

> "This was a draft public statement on the operational plans for the Afghan withdrawal."

নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে US-Taliban যে স্টেটমেন্ট তৈরি হচ্ছিল তাতে তালেবানদের দাবি লেখা হবে এরকম “All foreign forces would withdraw from Afghanistan” অর্থ্যাৎ

সকল বিদেশি সৈন্যকে আফগান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। বোল্টন বলেছেন "That certainly wouldn`t leave room for the counter-terrorism capabilities." অর্থ্যাৎ এতে একমত হলে কাউন্টার টেররিজমের কোনো সুযোগই থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি আমেরিকাকে তালেবানদের এই শর্ত মেনে নিতে হয়েছে।
বোল্টন তার এই অধ্যায় শেষ করেছেন এই বলে, (নেগোসিয়েশন যদি ফেল মারে) তাহলে "They (তালেবান) could simply wait, as they had often done before, and as Afghans had done for millennia. As the Taliban saying went, you have the watches, we have the time." অর্থ্যাৎ তালেবানরা অপেক্ষা করতে পারবে। তারা আঠারো বছর যুদ্ধ করেছে, প্রয়োজনে আরও আঠারো বছর যুদ্ধ করবে। আফগানরা এটা হাজার বছর ধরে করে দেখিয়েছে। আর তালেবানদের একটি প্রসিদ্ধ কথা "তোমাদের কাছে ঘড়ি থাকলে, আমাদের কাছে আছে সময়।"

বিশৃঙ্খলা যখন লাইফস্টাইল

"Chaos is a way of life" আট নম্বর অধ্যায়ের শিরোনাম এটি। এই বাক্য দিয়ে বোল্টন ট্রাম্প প্রশাসনকে বুঝালেও এটা অত্যন্ত যুৎসই একটি বাক্য পূর্বের সকল আমেরিকান প্রশাসনকে এক বাক্যে বুঝানোর জন্য। বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই যেন তাদের মজ্জাগত স্বভাব। এটাই তারা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেন ডালভাত। এসব তাদের জন্য গেইম শো। যেমন কেলিকে ট্রাম্প একবার বলেছিলেনঃ "it would be cool to invade Venezuela" অর্থ্যাৎ ভেনুজুয়েলায় আগ্রাসন চালালে বেশ মজা হতো।

জামাল খাশোগী হত্যা

কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সাথে আঁতাত ও তাদের প্রটেকশন দেয়াই যেন আমিরেকান প্রশাসনের প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। যেমন ধরেন ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সাংবাদিক, কলামিস্ট জামাল খাশোগি হত্যা। সৌদি আরব থেকে ১৫ জনের একটি কিলিং স্কোয়াড পাঠানো হয় ইস্তাম্বুলে। তুরস্কের ইনভেস্টিগেশন টিম ও নিউইয়র্ক টাইমসের অনুসন্ধান মতে ১৫ জনের এই টিমের সাথে সৌদি প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারা সৌদি কনস্যুলেটে খাশোগিকে ধোকা দিয়ে এনে হত্যা করে। তারপর লাশ কেমিক্যাল ব্যবহার করে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়। পুরো বিশ্বে তখন সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু সৌদি সরকার আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ায় আমেরিকা হত্যাকারীদের পক্ষাবলম্বন করে।

এখানে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এই হত্যাকান্ডে সৌদি প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান জড়িত ছিলেন। বোল্টন লিখেছেনঃ "On October 8, Kushner asked how we should respond to the growing storm"

অর্থ্যাৎ কুশনার জিজ্ঞেস করলেন, এই অবস্থায় আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? "next day we spoke with crown prince Mohammed bin Salman, emphasizing how seriously this issue was alredy viewed."

পরের দিন আমরা ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ এর সাথে আলোচনা করে ব্যাপারটার সিরিয়াসনেস জানালাম। "Trump had already decided on his response that he wasn`t going to cut off arms sales to the Kingdom." অর্থ্যাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে, এই ঘটনার কারনে তিনি সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করবেন না।

> "The Saudis subsequently published their version of the events and fired saveral senior officials. The saudi report didn`t satisfy most analysts, but it reflected a narrative that obviously wasn`t going to chang. during this period, through tweets and statements, Trump supported the emerging Saudi version and wavered from both the US-Saudi alliance generally or the massive arms sales already negotiated with the Kingdom."

অর্থ্যাৎ নিজেদের কিছু অফিসিয়ালকে চাকরিচ্যুত করে গা বাঁচানো স্টেটমেন্ট দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চেয়েছে সৌদি আরব। আর সেটাই গ্রহণ করে নিয়েছে আমেরিকান প্রশাসন। তবে সৌদি ভার্সন গ্রহন করে নিলেও, এটা যে সৌদির প্রতি তাদের দয়া, সেটা তারা প্রকাশ করতে ছাড়েনি।

> "The next day, November 20, Trump wanted to call Bin Salman to tell him the statement was coming out, saying "we are doing him a hell of a favor," namely stating that, "weather he did it or not, we`re standing with Saudi Arabia."

অর্থ্যাৎ ট্রাম্প মুহাম্মদ বিন সালমানকে ফোন করে বলতে চাচ্ছেন, দেখো! তোমাকে কিভাবে আমরা সাহায্য করছি। খাশোগিকে হত্যা করো বা নাই করো আমরা তোমার সাথে আছি। ন্যায়-অন্যায় ধর্তব্যের বিষয় নয়; আসল হলো স্বার্থ। বোল্টন লিখেছেন-

> "In hard-nosed geopolitical terms, Trump was the only sensible approach. Whether or not you liked Saudi Arabia, the monarchy. Mohammed bin Salman, or Khashoggi, we had significant US national interests at stake. Withdrawing support would immediatly trigger countervailing efforts by our adversaries."

অর্থ্যাৎ আমাদের চেয়ে কার্যক্ষেত্রে ট্রাম্পকেই এব্যাপারে সচেতন মনে হচ্ছিল। আপনার সৌদি, মুহাম্মদ বিন সালমানকে বা খাশোগীকে ভালো লাগুক বা না লাগুক, এই অঞ্চলের সাথে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ জড়িত। যা সৌদির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটা জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।

আমরা বইটির এগারো নাম্বার অধ্যায়ে চলে এসেছি। ট্রাম্পের ব্যাকগ্রাউন্ড, রাজনীতি নয় ব্যবসা। তাই রাজনীতির অনেক ফ্যাক্ট হয়তো তার জানা নেই। যেমন আমেরিকা দুনিয়ার অলিতে-গলিতে মিলিটারি বেস করে রেখেছে। এর মাধ্যমে তারা নিরাপত্তার একটি মেকি চাদর বিছিয়ে রেখেছে বিশ্বজুড়ে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ খরছও বহন করছে। কিন্তু ট্রাম্পের এ বিষয়ে জ্ঞান কম থাকায় তিনি প্রায়ই বলতেন-

> "why are we in all those countries?"

অর্থ্যাৎ আমরা ঐসব দেশে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছি? এমন সাধারণ একটি বিষয়ে আমেরিকার নাম্বার ওয়ান ব্যক্তিত্বের অজ্ঞতা প্রমাণ করে, আমেরিকা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। একটি রাষ্ট্রে মানুষ যখন ভোট দিয়ে এমন একজন অশিক্ষতকে প্রেসিডেন্ট বানায়, তখন বুঝাই যায় তাদের শিক্ষা ও জেনারেল জ্ঞানের স্তর কতটুকু নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। আর এই জাতিটাই যখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রভান্ডরের মালিক,

তখন বিশ্ব কতটুকু ডেঞ্জার ফেইস করছে বলার অপেক্ষা রাখে না। নিউক্লিয়ার বোমা নয় বরং আমেরিকার প্রশাসনই বিশ্ব মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

আমেরিকার কাছে সৌদি-আমিরাতের মর্যাদা

তবে ট্রাম্পের মাধ্যমে একটা জিনিস প্রকাশ পেয়েছে, আমেরিকানদের কাছে সৌদি-আমিরাতের মতো দেশগুলোর মর্যাদা। যাদের কাছে আমেরিকা নিরাপত্তা বিক্রি করে খায়। আমরা দেখেছি কিভাবে ট্রাম্প, সৌদি রাজাকে সংবাদ সম্মেলনে এসে অশ্রাব্য ভাষায় সম্বোধন করতো। আমেরিকার নিরাপত্তা দান ছাড়া এরা একদিন ঠিকতে পারবে না এটা ট্রাম্প জানতেন। তাই যে এমাউন্ট তারা শোধ করছে সেটাতে ট্রাম্প খুশি ছিলেন না। বলতেই হয় 'ঝানু ব্যবসায়ী ট্রাম্প'। বোল্টন লিখেছেন-

> "Trump was even more forceful than before that he wanted the Arab oil-producing countries to bear the full cost of whatever we`re doing."

অর্থ্যাৎ ট্রাম্প কড়াভাবে চাচ্ছিলেন, তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলো যেন আমেরিকাকে আরো বেশি টেক্স দেয়। কিন্তু আফগানিস্তানে সেই টাকা উৎপাদন হচ্ছিল না। তাই NSC এর এক মিটিংয়ে "get the f••k out, said Trump, which I took to mean both Iraq and Afghanistan." ট্রাম্প রেগে গিয়ে বলেন, 'ওই দেশগুলো থেকে বেরিয়ে আসো।

লন্ডন আসার পথে একবার বোল্টন আবুধাবিতে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ করেন ইউনাইটেড আরব আমিরাতের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন জায়েদের সাথে। তিনি লিখেছেনঃ "The Emirates were very worried about our nonresponse to Iran`s

recent provocations."
অর্থ্যাৎ ইরানের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্ক খারাপের দিকে চলে গেলেও সেটা যুদ্ধে গড়ায় নি। এতেই আমিরাতিরা হতাশ। তারা আসলে ইরানের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাধুক, এই এলাকায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ুক এটাই চাচ্ছিলেন। "Why Trump wanted to talk to Iran; I tried unsuccessfully, to explain Trump`s idea that talking didn`t really mean or imply anything other than talking. The Crown prince and the Gulf Arabs didn`t agree with that." অর্থ্যাৎ কথাবার্তা, আলোচনা এসব তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা যুদ্ধ চাচ্ছিলেন। তাদের চোখে যেন রক্ত চড়েছে।

আফগানিস্তানঃ আমেরিকার কবরস্থান

জন বোল্টনের এই বই পড়লে কিছুটা মেপে নেয়া যায় আমেরিকান প্রশাসনে থাকা অহংকারকে। কিন্তু আফগানিস্তান ইস্যু এলেই সেটা যেন ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। সেখানে শুধু পরিলক্ষিত হয় আফসোস ও

দোষারোপ। এগারো নাম্বার অধ্যায়ে বোল্টন আফগান ইস্যু নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। এখানে ১৩ নাম্বার অধ্যায়ে এসেও তিনি মূলত আফগান ইস্যু নিয়েই আলোচনা করেছেন। জুলমে খলীলজাদের নেতৃত্বে তালেবানের সাথে আমেরিকার যে দেনদরবার চলছিল, সেখানে আমেরিকার দাবি ছিলঃ "The US government opposed any such arrangement unless it was "condition based," meaning we would go to zero only if: (1) there were no terrorist activities in the country; (2) ISIS and Al-Qaeda were barred from establishing operating bases; (3) we had adcquate means of verification." অর্থ্যাৎ তালেবানদের দাবি অনুযায়ী আমেরিকা তাদের সৈন্য সংখ্যা শূন্যতে নিয়ে আসার চুক্তি করবে শর্তসাপেক্ষে। (১) সেদেশে কোনো সন্ত্রসী কার্যক্রম থাকবে না। এই শর্তটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটি সেন্সলেস শর্ত। একসময় তালেবানকে সন্ত্রাসী বলতো আমেরিকা। এখন বলে না। সুতরাং সে দেশে সন্ত্রাসী আগের মত থাকলেও, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হবে কি-না সেটা আমেরিকার হাতে। সন্ত্রাসী নেই, আমেরিকা এটা বলে দিলে বেরিয়ে আসতে কোনো বাধাই থাকে না। (২) আইএস ও আল-কায়েদা যাতে তাদের কোনো কার্যক্রম চালাতে না পারে। এই শর্তেও অসাধারণ গলদ। সচেতন মাত্রই জানেন আল-কায়েদাই তালেবান ও তালেবানই আল-কায়েদা। হক্কানী নেটওয়ার্ক আল-কায়েদার অংশ। আর হক্কানী নেটওয়ার্কের প্রধান তালেবানের ডেপুটি। অর্থ্যাৎ তালেবানের সাথে চুক্তির আলোচনা মানে হল আল-কায়েদার সাথেই চুক্তির জন্য আলোচনা চলছে। অথচ আমেরিকা আল-কায়েদাকে সন্ত্রাসী বলছে, কিন্তু তালেবানকে সন্ত্রাসী বলছে না। (৩) এসব কিছুর ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা থাকবে। সকল সৈন্য ফেরত নিয়ে আসলে কে সেটা ভেরিফাই করবে? তালেবান যদি বলে এখানে কোনো সন্ত্রাসী নেই, আমেরিকাকে সেটাই মেনে নিতে হবে। এজন্য বোল্টন

এটাকে বলেছেনঃ “This was touchingly naive.” অর্থ্যাৎ এসব শর্তারোপ ছিল মর্মস্পর্শী, বোকার মত বা শিশুসুলভ।

তালেবানের সাথে চুক্তি কি ট্রাম্পের একক সিদ্ধান্ত?

অনেকেই ভাবতে পারেন, মনে হয় ট্রাম্প একাই শুধু তালেবানের সাথে চুক্তি করতে চায়। বিষয়টা এমন নয়। বরং পুরো আমেরিকান প্রশাসন উদগ্রীব ছিল তালেবানের সাথে কোনরকম একটি চুক্তি করে বেরিয়ে আসতে। যেমন, বোল্টন বলেছেনঃ

> "Pompeo insisted it was the Pentagon that wanted a deal with the Taliban. to diminish threats toUS personnel as we reduced our presence; without such an agreement, the risks to the shrinking US forces were too great."

অর্থ্যাৎ সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পেও বলছিলেন, মূলত পেন্টাগন বা আমেরিকান ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট বা আমেরিকান মিলিটারি যেটাই বলেন, তারা চাচ্ছিল তালেবানের সাথে একটা চুক্তি হয়ে যাক। যাতে সৈন্যদের হতাহত হওয়া থেকে বাঁচানো যায়। কারণ অলরেডি ডুবতে থাকা আমেরিকান বাহিনীর জন্য চুক্তি ছাড়া বেরিয়ে আসা চূড়ান্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।

বোল্টন লিখেছেন, আমেরিকার জন্য “কন্ডিশন বেইজড” বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা নেশার মত কাজ করেছে। আনেকেই এত খুশি হয়েছেন। কিন্তু এই খুশি ছিল সাময়িক। কারণ তালেবানের মূল দাবি “টোটাল উইথড্রয়াল”। এসব শর্ত ভেঙে গেলে তালেবানদের কিছুই যায় আসে না। ট্রাম্পের মতে “Once we were on the nosedive to zero, that`s where we would finish.” অর্থ্যাৎ আমাদের সৈন্য সংখ্যা শূন্যতে নিয়ে আসার সাথে সাথেই আমরা শেষ হয়ে যাব।

আমাদের কোনো প্রভাব বা কথা বলার অধিকার থাকবে না। মোটকথা আমরা অপয়া হয়ে যাব।

তালেবানের সাথে আলোচনায় আমেরিকার সকল হিসেব-নিকেশের ওলট-পালট

তালেবানের সাথে আলোচনা যত আগাচ্ছিল, আমেরিকার সকল হিসেব নিকেশ ততো ওলট-পালট হচ্ছিল। একের পর এক আমেরিকাকে অবস্থান বদলাতে হচ্ছিল। বোল্টন লিখেছেন, "মার্চের ২১ তারিখে Shannan and Dunford brought a chart. Showing several ways the state department had departed from what the Pentagon believed were the agreed negotiating guidelines. objectives were completely detached from what I considered to be our objective."
অর্থ্যাৎ সানাহান ও ডানফোর্ড একটি চার্ট এনে দেখাচ্ছিলেন কিভাবে ও কতটুকু স্টেট ডিপার্টমেন্ট অরজিনাল নেগোসিয়েশন গাইডলাইন থেকে সরে এসেছে। বোল্টনের কাছে মনে হয়েছে, প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে আমেরিকা সম্পূর্ণরূপে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমার মতে এটা আমেরিকার পরিস্কার পরাজয়।
আগস্টের ১৬ তারিখ শুক্রবার জুলমে খলিলজাদ ও পম্পেও এর সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটিসহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে এক বিশাল গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। "A small army of people would be attending the Bedminter meeting." যেন ছোট এক আর্মি মিটিংয়ে যুক্ত হচ্ছিল। দুপুর একটার কিছু পরে মিটিং পম্পেও এর "we are not quite done with the Taliban." অর্থ্যাৎ তালেবানের সাথে চুক্তির পুরোটা সামাধান হয়নি, এ কথা বলার মাধ্যমে শুরু হয়। একটু পরে ট্রাম্প আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনীর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেন। কীভাবে দুবাইয়ে গনী

ফ্ল্যাটবাড়ি করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ট্রাম্পের মেজাজ আরো গরম হয়, যখন পম্পেও বলেন গনী তো এখন প্রেসিডেন্ট। এখন মিলিটারি তার নিয়ন্ত্রণে। ট্রাম্প বললেনঃ "Who pays them?" অর্থ্যাৎ মিলিটারি ও গনীকে বেতন দেয় কে? এসপার বলেন "We do" তখন ট্রাম্প আরো গরম হয়ে উঠেন। ম্যাটিসের ব্যাপারে যা-তা বলেন। ম্যাটিস প্রায়ই বলতেন "Those soldiers are fighting bravely for their country." অর্থ্যাৎ আফগান সৈন্যরা সাহসিকতার সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করছে। এসময় ট্রাম্প জানতে পারেলেন, আফগান সৈন্যদের পেছনে আমেরিকাকে বছরে প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়। ট্রাম্প বললেনঃ " they are the most highly paid soldiers in the world." অর্থ্যাৎ এরাতো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল সেনাবাহিনী।

এখান থেকে বিশাল একটি ফ্যাক্ট বেরিয়ে এসেছে। সেটা হল আমেরিকা আফগান থেকে বেরিয়ে এলে সেদেশের আর্মিকে ফান্ডিং দেয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। এতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে পুরো আফগান ফোর্স। বিজয়ের জন্য তালেবানকে যুদ্ধ করতে হবে না। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকা বা এর বাইরের সতর্ক এক্টররা সবাই জানেন। এজন্য দেখা গেছে বিভিন্ন দেশ কাবুল সরকারকে নয়, তালেবানকে দাওয়াত করছে তাদের দেশে অফিসিয়াল সফরের জন্য।

এরপর মিটিংয়ে ট্রাম্প বলেনঃ "They hate us. Taliban wants their land. We went into take their land." অর্থ্যাৎ তারা আমাদের ঘৃণা করে। কারণ তারা তাদের দেশ ফেরত চায়। আমরা তাদের দেশ দখলের জন্য তাদের দেশে গিয়েছি। যাক খলিলজাদ জানান এসপার, ডানফোর্ড, হাসপেলসহ সকলেই খসড়া তালেবান চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছেন। বোল্টন বলছিলেন তিনি এমন লজ্জাজনক চুক্তির সাথে একমত নন। তখন খলিলজাদ বলেনঃ "This was the

best we could do" অর্থ্যাৎ এটাই বেস্ট। এরচেয়ে ভাল চুক্তি নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সকল সৈন্য প্রত্যাহারের তালেবানের ডিমান্ড মেনে নেয়া সত্যিই এক লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাম্প নিজেও সেটা বুঝতে পারছিলেন। বোল্টন লিখেছেন-

> "Pompeo thought Trump appreciated how devastating it would be to see the zero level in writing. especially with all the condition-based language somewhere out in the weeds."

অর্থ্যাৎ সৈন্য সংখ্যা শূন্যতে নামাতে হবে। কিন্তু পূর্বেকার সিদ্ধান্ত ছিল, চুক্তি হবে শর্তসাপেক্ষে। সেই 'শর্তসাপেক্ষ' এর খবর নেই। এর পরিণাম হবে মারাত্মক। এজন্য পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে ফক্স নিউজের সাথে একটি রেডিও ইন্টারভিউয়ে ট্রাম্প বলেনঃ "We are going to keep a presence there." অর্থ্যাৎ আমাদের কিছুটা উপস্থিতি থাকবে সেখানে। যদিও সেটা ছিল ভূয়া। কারণ পুরো সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের পর কিভাবে সেখানে সৈন্য উপস্থিত থাকবে? এমন কোনো কথা চুক্তিতেও লেখা নেই। ঐতিহাসিক যুদ্ধ, বিশাল অঙ্কের অর্থনৈতিক ব্যয়, সম্পূর্ণটা পানিতে যাবে।

মিটিংয়ের একপর্যায়ে ট্রাম্প বলেনঃ

> "I want to speak to the Taliban. Let them come to Washington. Trump said. I want Ghani here too, as well as the Taliban. Let`s do it before it`s signed. I want to meet before it`s signed. not a phone call."

অর্থ্যাৎ আমি তালেবানদের সাথে সরাসরি মিটিং করতে চাই। সাথে গনীকেও দাওয়াত করো এখানে ওয়াশিংটনে। এ নিয়ে আলোচনা হয়।

সেদিনের আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ছিল ইউক্রেন ইস্যু। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো আলোচনার সুযোগই তৈরি হয় নি। পুরো সময়টা আফগানিস্তানেই চলে যায়। যাইহোক আমেরিকার জন্য পরিষ্কারভাবে এই চুক্তি একটি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও পরাজয় হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। এদিকে "Trump wanted the Taliban and Ghani meeting at Camp David" ট্রাম্প চাচ্ছিলেন মিটিংটা ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিডে হোক। এই স্থান আমেরিকার অনেক ইতিহাসের সাথে জড়িত। এবং আমেরিকানদের জন্য একটি গর্ব করার মত জায়গা। সেখানে তালেবানের সাথে মিটিংয়ের আয়োজনের জন্য সকল ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সিকিউরিটি ব্যবস্থায় বেশি কড়াকড়ি না রাখার জন্য ট্রাম্প বলে দেন। বলেন, এতে তালেবান আপসেট হতে পারে। "He (Trump) worried that too-intrusive security measure would offend the Taliban dignity."

যাইহোক এত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকান প্রশাসনের অস্থিরতা ছিল এই নিয়ে যে, আমেরিকার জন্য কত খারাপ হয়েছে এই চুক্তি। এটাকে সারেন্ডার চুক্তি বলা যায়। এমতাবস্থায় কাবুলে তালেবানের হামলা ও একজন আমেরিকান সৈন্য নিহতের খবর এল। নাইন ইলেভেনের হামলা বার্ষিকীর দিনের ঠিক আগমূহুর্তে ট্রাম্পের সাথে হামলাকারীদের প্রশ্রয়দাতা তালেবানদের সাথে ক্যাম্প ডেভিডে বৈঠক হলে বিশাল এক খারাপ প্রভাব ফেলবে। ব্যাপরটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল ট্রাম্পের কাছে। বোল্টন ও অন্যান্যরা ভাবলেন এ বিষয়ে ট্রাম্পকে বলা দরকার। কমপক্ষে যদি কিছুটা দেরি করানো যায়। এমতাবস্থায় ট্রাম্প নিজ থেকেই বললেন,

> "put out a statement that says, we had a meeting scheduled, but they killed one of our soldiers and nine other, so we cancelled it?

there should be a cease-fire, or I don`t want to negotiate. We should drop a bomb, hit`em hard. If they can`t do a cease-fire I don`t want an agreement."

অর্থ্যাৎ তারা আমাদের একজন সৈন্য হত্যা করেছে বলে মিটিং ক্যানসেল করে দাও। যুদ্ধবিরতি না করলে তাদের সাথে কোনো আলোচনা নয়। আমাদের উচিত তাদের উপর বড় বড় বোমা ফেলা। তারা যদি যুদ্ধবিরতি না করে আমিও চুক্তি করতে চাই না।

কিন্তু ট্রাম্পের এসব কথা বলার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল, তালেবানরা ট্রাম্পের সাথে চুক্তি করছে না, চুক্তি হচ্ছে আমেরিকার সাথে। আর এই আলোচনাও ট্রাম্পের সময়কালে শুরু হয় নি। শুরু হয়েছে অনেক আগে। আলোচনা শুরু করতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়েছে। আলোচনার মধ্যস্থতায় কাতার, নরওয়ে, রাশিয়াসহ অনেক দেশই উপস্থিত ছিল। তাই একটি স্ট্যাটমেন্ট দিয়ে সেটাকে ক্যানসেল করা সম্ভব নয়। এদিকে কাবুলে থাকা গণীর সরকার ভাবছেন যে, ইলেকশনে জিতে যদি বাইডেন প্রশাসন আসে, তাহলে হয়তো চুক্তি বাতিল হতে পারে। সেটাও সঠিক নয়। কারণ একই। চুক্তি পুরো প্রশাসনের সাথে হয়েছে। আর আমেরিকান প্রশাসন আফগানে ডুবছে। কোনো মিরাকল না হলে, এটা বাস্তবায়িত হতে থাকবে। আর বোমা মেরে যুদ্ধাবরতিতে রাজি করাতে পারলে তো অনেক আগেই সেটা করা যেত। অতএব এসব ছেলেমানুষি কথা ছিল। তবে আলোচনা বন্ধের এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় তালেবানরা বলেছিল, “USA would be harmed more than anyone” by cancelling that meeting.” অর্থ্যাৎ এতে সবচেয়ে বেশি আমেরিকারই ক্ষতি হবে। তারা বলেছিলেন যুদ্ধ আমরা ১৮ বছর করেছি, প্রয়োজনে আরও ১৮ বছর করব।

যাইহোক, পরবর্তিতে জন বোল্টন তার পদ থেকে রিজাইন করেন। এবং ট্রাম্পও তালেবানদের সাথে আলোচনা পুনরায় শুরু করেন।

"on Saturday February 29th 2020 the United State and the Taliban signed an agreement that, in my view looked very much like the agreement that had come unstuck in September." অথ্যাৎ ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তালেবানের সাথে আমেরিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার টার্ম এন্ড কন্ডিশন ক্যানসেল হওয়া চুক্তির মতোই ছিল।

জন বোল্টনের এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমাদের মতো আন্তর্জাতিক পাঠকদের জন্য আর তেমন প্রয়োজনীয় কোনো খোরাক নেই। সুতরাং আমরা এখানেই বইটি নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি টানছি। অবশ্য এই অধ্যায় নিয়ে লেখার সময় অলরেডি আমেরিকার ৫৯তম প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন সমাপ্ত হয়েছে। এতে ট্রাম্প পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু ট্রাম্প পরাজয় স্বীকার না করে ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে কোর্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেনই বিজয়ী। সিদ্ধান্ত নেয়ার দিন ট্রাম্প সমর্থকরা ক্যাপিটাল হিলে হামলা করে। এই হামলাকে অনেকেই ৯/১১ এর চেয়েও বড় হামলা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ যেন পুরো আমেরিকান সিস্টেমের উপর হামলা। এদিকে ডেমোক্রেটরা ট্রাম্পকে ইমপিচ করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে এটা পরিষ্কার উস্কানিও বটে। ২০২১ সালের পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা অনেক যুগান্তকারী ঘটনা প্রত্যক্ষ করবো বলে মনে করছি।

০১, ফেব্রুয়ারী, ২০২১ । সমাপ্ত

ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ

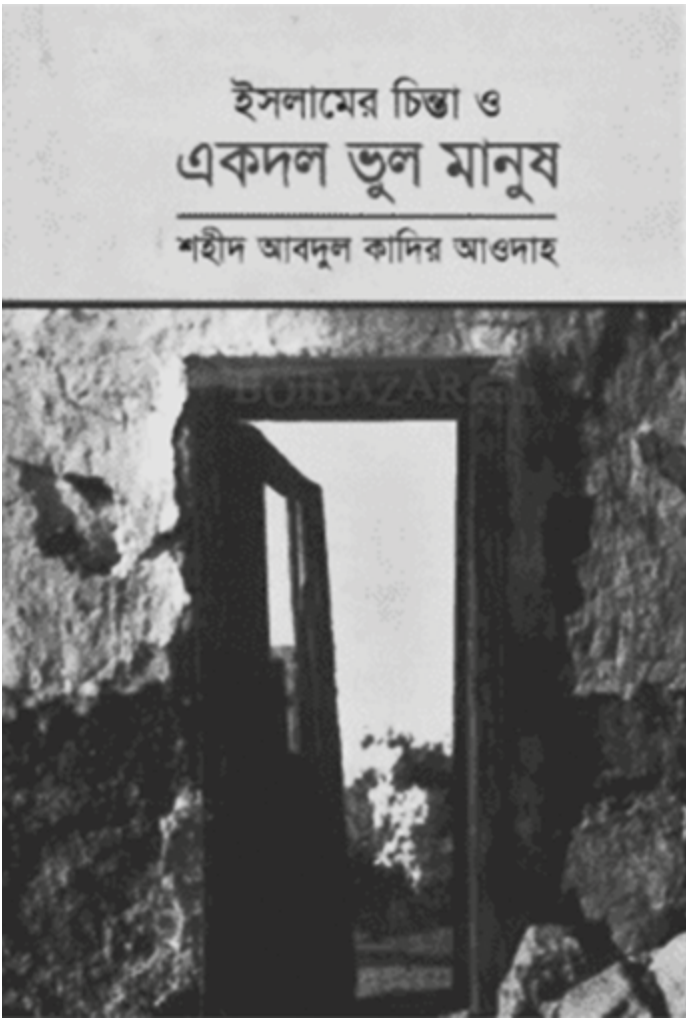

অনুবাদঃ হোসাইন আহমদ

জেনোসাইড ইন মায়ানমার

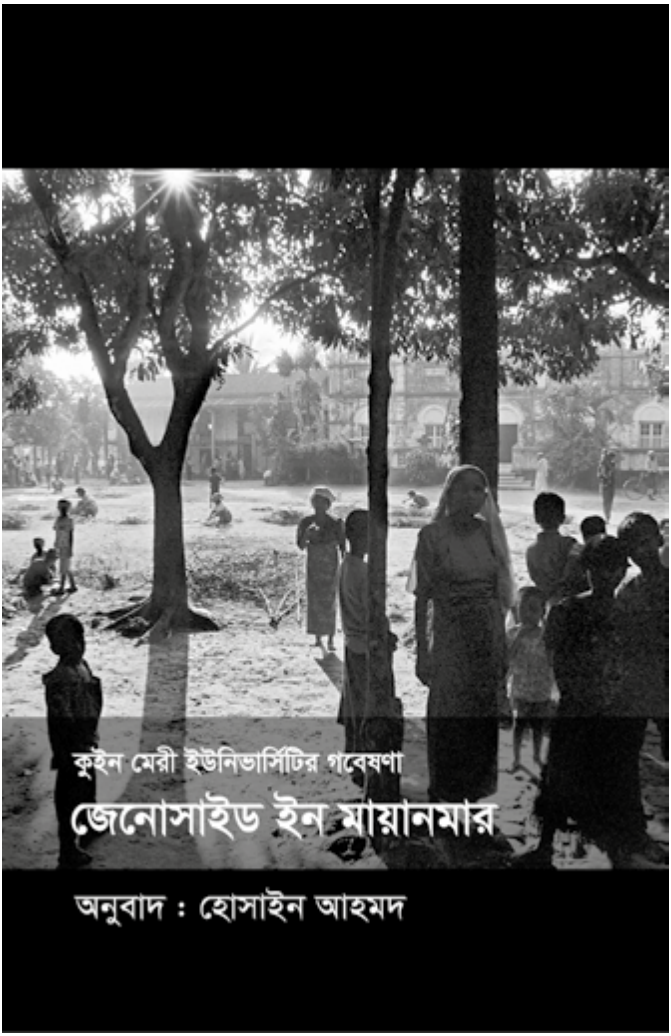

উইটনেস টু হরর

মায়ানমার আর্মির ধর্ষণ ও অন্যান্য নৃশংসতার
ব্যাপারে একুশ জন মহিলার জবানবন্দি
উইটনেস
টু হরর
অনুবাদ : হোসাইন আহমদ

লেখক পরিচিতি

নাম: হোসাইন আহমদ
পিতা: হাফিজ খবীর আহমদ বিন বশীর আহমদ শায়েখে বাঘা রহঃ
জন্ম: ডিসেম্বর, ১৯৮৩
জন্মস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।
স্থায়ী ঠিকানা: দক্ষিণ বাঘা,গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বর্তমান ঠিকানা: ডকল্যান্ড, পূর্ব লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম।

হোসাইন আহমদ ২০০৩ সালে জামেয়া হুসাইনিয়া ইসলামিয়া গহরপুর, সিলেট থেকে দাওরাহ হাদিস এবং ২০০৪ সালে জামেয়া মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে তাখাস্সুস ফিল তাফসীর সম্পন্ন করেন। লেখালেখির অভ্যাস সেই ছোটবেলা থেকেই। ২০০১-২০০২ সালে জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক আল-ফারুকে কাজ করেন। তিনি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার আগ্রহ তৈরী করতে ২০০৮ সালে ইসলামিক লার্নার্স ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ২০০৯ সালে তিনি ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন। ২০১৩ সালে মাসিক আল আহরার নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের করেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কাজ করার মানসে ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে সিম্পল রিজন নামে একটি সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা আর্তমানবতার সেবায় ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের হালাল ব্যাবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠা করেন ব্যবসায়ী সংগঠন "দ্য এসোসিয়েশন অব হালাল রিটেইলারস"। তার লিখিত তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ, জেনোসাইড ইন মায়ানমার এবং উইটনেস টু হরর।

Youtube chanel
Hussain Ahmed
https://www.youtube.com/channel/UCEzvQPrn0P4qB2mmTu99Dvg

Website
Global Affairs
https://theglobalaffairs.info/

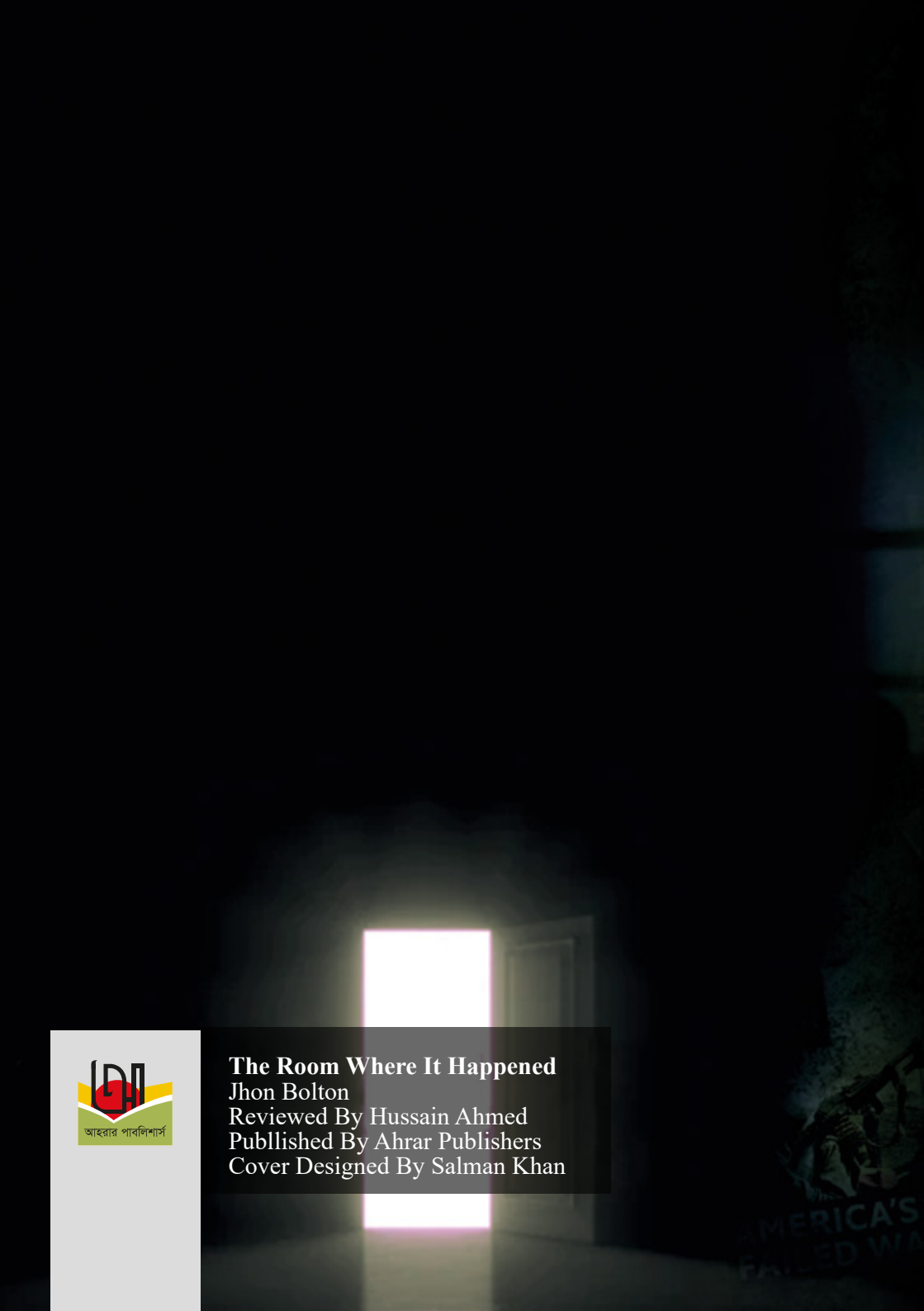

The Room Where It Happened
Jhon Bolton
Reviewed By Hussain Ahmed
Publlished By Ahrar Publishers
Cover Designed By Salman Khan